Aslaf Academy

লেকচার ৩২ : সিরাত পাঠ নিয়ে ধোঁয়াশা।

কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৩২ : সিরাত পাঠ নিয়ে ধোঁয়াশা।

সিরাতের উৎস মূল কী? আমরা কোত্থেকে সিরাতের পাঠ গ্রহণ করবো?

বর্তমানে প্রাচ্যবিদদের বড় একটা অংশের আপত্তি হলো- মুসলমানদের নবির সিরাত বা তাঁর থেকে বর্ণিত 'সুন্নাহর' উৎস নড়বড়ে। সেখানে অবিশ্বাস করার মতো অনেক কিছু আছে, চাইলেই তাতে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, মুসলমানদের নবির সিরাত লেখা হয়েছে নবির মৃত্যুর অনেক পরে। কাজেই একজন মানুষের মৃত্যুর দীর্ঘ সময় পরে লিখিত কাহিনিতে অনেক গাল-গল্প ঢুকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এজন্যই আমরা নবির সিরাত কিংবা সুন্নাহয় অনেক অলীক বিষয় দেখতে পাই। নাউযুবিল্লাহ!

প্রাচ্যবিদদের এসব অপআলাপে আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আমাদের ইসলাম এমন ভঙ্গুর কোনো দ্বীন নয় যে, এর ইতিহাস আমাদেরকে ওদের থেকে জানতে হবে। আমাদের ইতিহাস তো সুসমৃদ্ধ। আমরা একটু চোখ ফেরালেই সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পারবো। জানতে পারবো। আমাদের নবির জীবন কিংবা তাঁর বর্ণিত সুন্নাহ কবে থেকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর সঠিক ইতিহাস লিখে গেছেন আমাদের পূর্বসুরীরা। আমাদের আকাবির ড. মুস্তফা আযমি রহিমাহুল্লাহ এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর কাজটি করে গেছেন। তিনি 'কুততাবুন নাবি' নামে চমৎকার এক কিতাব লিখেছেন। যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন, স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই তাঁর জীবনাচার লিখিত হয়েছে। একজন দু'জন নয়; বরং ৪৮ জন মহান সাহাবি এ মহৎ কাজটি করতেন। ভাবা যায়! এত বিপুল সংখ্যক সাহাবি নবিজির জীবনাচার লিখলেও কেবল ২য় শতাব্দিতে লিখিত হাদিসের প্রসিদ্ধ ও বর্তমান কিতাবাদির উপর ভিত্তি করে একটা মিথ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, নবিজির (সঃ) জীবনাচার তাঁর ইন্তেকালের শত বছর পর লেখা হয়েছে! মিথ্যাচারেরও একটা সীমা থাকা উচিত। তাছাড়া বর্তমানে হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবাদি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি কিতাব

নবিজির (সঃ) জীবনেও লেখা হয়েছে। সেসবের সবগুলো আমাদের হাতে বর্তমান না হলেও অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। নবিজির (সঃ) জীবদ্দশায় লিখিত হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিখ্যাত 'আস সহিফাতুস সহিহা' গেল কয়েকবছর আগে জার্মানের বার্লিনে একটি গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে। গবেষকরা নিশ্চয়তাও দিয়েছেন যে, এটা নিঃসন্দেহে আবু হুরায়রার-ই কিতাব। এছাড়াও আরো অনেক কিতাবই নবিজির (সঃ) জীবদ্দশায় লিখিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। সেসব যদিও একাডেমিক রূপ লাভ করেনি। প্রথমত একাডেমিক রূপটা শুরু হয়- সাহাবি উরওয়া ইবনে যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে। তিনি পাণ্ডুলিপি আকারে নবিজির জীবনচরিত সংকলন করেন 'মাগাযি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নামে। তাঁর এই কিতাবটা যদিও কিতাব আকারে আমাদের হাতে পৌঁছেনি। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ অংশ হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবাদিতে বিবৃত হয়েছে। বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফে আবদির রাযযাক ইত্যাদি হাদিসের প্রাচীন গ্রন্থাদি খুললেই আমরা সে কিতাবের বড় একটা অংশের হদিস পাবো।

দ্বিতীয়ত সিরাতের একাডেমিক একটা রূপ দেন মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরি রহিমাহুল্লাহ। তিনি উমাইয়া শাসনামলে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিযের নির্দেশে সিরাত ও হাদিসের বড় একটা অংশ সংকলন করেন।

আব্বাসি খিলাফতের সময় একাডেমিক রূপটা আরেকটু ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময়ে মুসা ইবনে উকবা রহিমাহুল্লাহ 'মাগাজি' নামে নবিজির যুদ্ধজীবনের ধারা বিবরণী কিছুটা বিস্তারিতভাবে সংকলন করেন। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ তাঁর সংকলিত এই সিরাতের ভুয়ূসী প্রশংসা করে বলেছেন – 'তোমাদের উচিত মুসা ইবনে উকবা সংকলিত মাগাজিকে গ্রহণ করা। কেননা তা নবি জীবনের সবচেয়ে সঠিক যুদ্ধ বিবরণী'। মুসা ইবনে উকবার সংকলিত সিরাতের অংশবিশেষ এই প্রাচীন গ্রন্থটাও আমাদের হাতে পুরোপুরি পৌঁছেনি। কেবল ২৫-৩০ পৃষ্ঠার মতো পৌঁছেছে। তবে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধতম যে সিরাতগুলোর সাথে আমরা পরিচিত, যেমন – সিরাতে ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ওয়াকেদি ও ইবনে সা'দ, তাবারিসহ অন্যান্য ইতিহাসবেত্তাগণ সবাই-ই এই মুসা ইবনে উকবার কিতাব থেকে অন্বেষণ করেছেন।

প্রসঙ্গত সিরাতে ইবনে হিশাম ও সিরাতে ইবনে ইসহাক নিয়ে আলাচনা করা যাক। এ দুই সিরাতের সংকলনকাল নিয়ে আলোচনা করলেও আমরা প্রাচ্যবাদের মুখোশের ভেতরের চেহারা দেখতে পাবো। সিরাতে ইবনে হিশাম লিখিত হয়েছে সিরাতে ইবনে ইসহাকের অন্তত ৭০-৮০ বছর পরে। কারণ, ইবনে ইসহাকের মৃত্যু হয়েছে ১৫১ হিজরিতে। আর ইবনে হিশামের মৃত্যু হয়েছে ২১৮ বা ২২০ হিজরির দিকে। দু'জনের মাঝে ৭০ বছরের পার্থক্য। আবার ইবনে হিশাম তাঁর সিরাত লিখতে গিয়ে অধিকাংশ জায়গাতেই ইবনে ইসহাকের লিখিত সিরাতের অনুসরণ করেছেন। যদিও ইবনে ইসহাকের সিরাতটা আলাদা পাণ্ডুলিপি আকারে আমাদের কাছে পুরোপুরি বিদ্যমান নেই।

প্রসিদ্ধ প্রচ্যবিদ আলফ্রেড গিওম ইবনে হিশামের ইংরেজি করেছিলেন। অথচ, তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সিরাতে ইবনে ইসহাক'। কতবড় মিথ্যাচার চিন্তা করুন! অনুবাদ করছেন ইবনে হিশামের। কিন্তু নাম নিয়েছেন ইবনে ইসহাকের। এই কাজটা তিনি করেছিলেন খুবই ধূর্ততার সাথে। কারণ, তিনিও জানতেন ইবনে ইসহাকের সিরাতটা আমাদের কাছে পুরোপুরি নেই। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের সিরাত থেকে অন্বেষণ করলেও তিনি অনেক কিছুই সংযোজন করেছেন। এখন যে কিতাবের অস্তিত্ব-ই নেই পুরোপুরি। সে কিতাবের অনুবাদ আলফ্রেড গিওম কেন করলেন বা কীভাবে করলেন? এটা বড় একটা মিথ্যাচার। উপরন্তু শুধু এখানেই তিনি শেষ করেননি। তিনি ইবনে হিশামের সিরাতকে ইবনে ইসহাকের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এই ধূর্ততায় তিনি একাধারে অনেকগুলো ফায়েদা নিতে চেয়েছেন। যেমন -

১. সিরাতে ইবনে ইসহাক বলে চালাতে পারলে সিরাতের প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে একটু আলাদা মনোযোগ ও সিম্প্যাথি নেওয়া।

২. ইবনে হিশাম প্রসিদ্ধ ও মানুষের হাতে হাতে হওয়ায় চাইলেই ইবনে হিশামের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের সংমিশ্রণ ঘটানো যাবে না। পক্ষান্তরে ইবনে ইসহাকের নামে চালালে সহজেই বানোয়াট তথ্যের সংমিশ্রণ ঘটানো খুবই সহজ। কারণ, কেউ চাইলেই সিরাতে ইবনে ইসহাক খুলে তার মিথ্যা ও ছলচাতুরি ধরে ফেলতে পারবে না।

আমাদের অনুমেয় এই দুই চালাকিকে তিনি ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। অসংখ্য বানোয়াট তথ্যের মাধ্যমে তিনি নবিজির সিরাতকে কলুষিত করেছেন। এর মধ্যে একটা ব্যাপার তো আমাদের দেশে খুবই প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৮ সালে উলামায়ে কেরাম যখন লালনের ভাস্কর্য নিয়ে আন্দোলন করছিলেন তখন আমাদের হুমায়ূন আহমেদ এক আবেগী প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই প্রাচ্যবিদ আলফ্রেড গিওমের মিথ্যাপূর্ণ কল্পিত সিরাতে ইবনে ইসহাক

পড়ে। সেখানে তিনি এই অনুবাদের সোর্স উল্লেখ করে লিখেছেন – আলেমরা ভাস্কর্যের বিরোধিতা করে কেন? নবিজি নিজেই তো মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা প্রাঙ্গনের ৩৬০ টি মূর্তি ভাঙলেও 'মেরি গোমেজের' ভাস্কর্যকে রেখে দিয়েছেন!

এই যে নবি জীবন নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার। এর দায়ভার কে নেবে? আলফ্রেড গিওমের এই মিথ্যাচার যদিও ধোপে টেকেনি। তার এই বর্ণনা না আছে সিরাতে ইবনে ইসহাকে না আছে ইবনে হিশামে। তাহলে এই কাজ কীভাবে করলেন? তিনি 'আখবারু মক্কা' নামে ইমাম আযরাকির একটি কিতাব থেকে আগে পরের সংযোজন বিয়োজন ছাড়াই সোজা উল্লেখ করে দিয়েছেন। এবং চালিয়ে দিয়েছেন সিরাতে ইবনে ইসহাকের নামে। কত বড় মিথ্যাচার! আমাদের হুমায়ূন আহমেদরা প্রায়ই এসব প্রাচ্যবিদদের বস্তাপঁচা গালগল্প শুনিয়ে আমাদেরকে ধর্মের সবক দিতে চান। অথচ, তারা জানেন না তাদের জ্ঞান কতটা সীমিত। তাদের কাছে কোনো গ্রন্থের প্রামাণ্যতার দলিল হচ্ছে তা অ..ফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত হওয়া। এই যে ... দৈন্য ও কাঙালপনা এই মানুষগুলো এসব করে গবেষক(!) অবিধা পেয়ে যান কেবল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে।

পশ্চিমারা এই যে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও স্পিরিচুয়ালিটির জায়গা নিয়ে নিত্য খেলা করে যান, এসব আমরা ক'জন বুঝি। ক'জন বুঝতে পারি তাদের ধূর্তামি! আরেকটা উদাহরণ দেই তাদের ধূর্তামির। এই ঘটনায় তারা কেন এসব করে তার নার্ভটা আমরা ধরে ফেলতে পারবো। এই যে গত শতাব্দীর কথা। 'স্যামুয়েল যুইমার' নামে এক প্রাচ্যবিদ ছিল। পশ্চিমা গবেষকদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থেকে যে ক'জন মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে ইসলামের, 'স্যামুয়েল যুইমার' তাদের অন্যতম। সে প্রথমে হিন্দুস্তানে গিয়েছিল। সেখান থেকে মিশরে এসেছিল। এখানে এসে আরবি শিখেছে এবং ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে পড়ালেখা করেছে। এরপর সে 'কিতাবুল হিদায়া' নামে চার খণ্ডে একটা কিতাব লিখেছে। ১৮৯৫ সালে এই কিতাবটা কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। এই কিতাবে সে ইসলামের যে যে জায়গাগুলোতে আপত্তি তোলা হয়েছে কিংবা আরও যে সকল বিষয়ে আপত্তি তোলা যায় সবগুলোকে একত্রিত করেছে। কী চতুর! চিন্তা করেন। কিতাবের নাম হলো 'কিতাবুল হিদায়া'। অথচ, তার মধ্যে জঘন্য মিথ্যাচারে ভরা। যেন সে এই নাম ব্যবহার করে মুসলিমদেরকে হিদায়ার দিকে আহবান করছে! অথচ, তার উল্লিখিত প্রতিটি আপত্তির জবাব শত শত মুসলিম গবেষকরা দিয়েছেন তারও অনেক আগে। সাধারণত প্রাচ্যবিদরা ইসলামের উপর কী আপত্তি তোলে?

- নবিজির বহু বিবাহ
- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অল্প বয়সে বিবাহ
- বনু কুরাইযাকে নবিজি হত্যা কেন করলেন
- আবু বকর ও আলী রাদিয়াল্লাহু কেন্দ্রিক শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব
- কুরআন থাকতে হাদিস মানবো কেন
- বুখারি মুসলিম ইত্যাদি হাদিসের কিতাব মানতে হবে কেন

এই নির্দিষ্ট একটা ফ্রেম থেকে গুটিকয়েক আপত্তি ইসলামের উপর তোলা হয়। এসবের উত্তর অসংখ্য মনীষী দিয়ে গেছেন। এরপরও নতুন করে চটকদার শিরোনামে প্রচ্যবিদরা মানুষের মাঝে ছড়ায় কী উদ্দেশ্যে – এটা তো সুস্পষ্ট। এরপরও উম্মাহর উলামায়ে কেরাম স্যামুয়েল যুইমারের নতুনভাবে উত্থাপিত এসব আপত্তির জবাব দিয়েছেন। ফলে তার কিতাব প্রকাশের ১০০ বছর পর আল আযহার বিশ্ববিদ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ড. মাহমুদ দাউদের তাহকিকে 'কিতাবুল বয়ান' নামে একটি কিতাব লেখা হয়। এই কিতাবে সবিস্তারে তার কিতাবের সবক'টি আপত্তির দালিলিক জবাব দেওয়া হয়।

স্যামুয়েল যুইমার তার কিতাবে একটি হাস্যকর বিষয়ের অবতারণা করে। আর তা হলো – ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোনো স্ট্রাকচারাল কোনো ভিত্তি নেই। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের ধারণাটা কেমন হবে, এটার কোনো কনসেপশন ইসলামে নেই। ইসলাম কেবল আত্মিক স্পিরিচুয়ালিটির নাম। ইসলাম কেবল ব্যক্তিজীবনে মানুষকে পথনির্দেশ করে। মানুষ কেবল বাক-স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকবে। মুসলিমরা রাষ্ট্র নিয়ে আলাপ তুলতে পারবে। কিন্তু রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে না। কারণ, রাষ্ট্র গঠনে ইসলামে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক নেই। ড. মাহমুদ দাউদ খুঁজে বের করেছের - ইসলামের উপর এই যে আপত্তি, এটা কি স্যামুয়েল যুইমার নিজে তুলেছে নাকি তার আগেও কেউ এই আপত্তি তুলেছে? সে কি কেবল চর্বিত চর্বন করেছে?

গবেষণায় দেখা গেল, সপ্তম শতকে অর্থাৎ, ৬০৯ হিজরিতে এক স্প্যানিশ খ্রিস্টান সর্বপ্রথম এই আপত্তি তুলেছিল। সেও দাবি করেছিল – ইসলামে রাষ্ট্র গঠনে কোনো মৌলিক অবকাঠামো নেই। তখন আমাদের এক মহান মনীষী আলি ইবনে মাসঊদ আল খুযাঈ আত তিলমিসানি রহিমাহুল্লাহ তার জবাবে ঐতিহাসিক এক কাজ করেছেন। তিনি ইসলামে রাষ্ট্র চিন্তা নিয়ে ২০ খণ্ডের এক কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম হচ্ছে – "তাখরিযুদ দালালাতিস সাম'ইয়্যা আলা মা কানা ফি আহদি রাসুলিল্লাহি মিনাল হিরাফি ওয়াল মিহানি

ওয়াস সানাইয়ি' ওয়াল আমালাতিশ শর'ইয়্যাহ"। এই সুবিশাল কিতাবে তিনি দেখিয়েছেন ইসলামের সৌন্দর্য। রাষ্ট্র চিন্তায় ইসলাম কতটা অগ্রসর।

এখানে তিনি দেখিয়েছেন ইসলামী মিশনারী, হোম মিনিস্ট্রি, ফরেইন মিনিস্ট্রি, আর্ম ফোর্স, ওসান সিস্টেম, বহির্বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক, শূরা কাউন্সিল ইত্যাদি গঠনে ইসলামের নিজস্ব ফ্রেমওয়ার্ক। অর্থাৎ, একটা রাষ্ট্র চলতে হলে অবকাঠামোগত যতগুলো দিক আছে তা সবই যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনার রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে ছিল, সেসবের সবিস্তার উল্লেখ তিনি করেছেন।

বোঝা গেল, ২০০ বছর আগে স্যামুয়েল যুইমার কিতাবুল হিদায়ায় যে সকল আপত্তি তুলেছে তা মূলত সপ্তম শতকের একটি আপত্তি। যার প্রতি উত্তরে ২০ খণ্ডের এক বিশাল কিতাব লিখিত হয়েছে! আরো মজার ব্যাপার হলো – হিজরি ত্রয়োদশ শতকে আবার আরেকজন পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ এই আপত্তিকে নতুনভাবে আলোচনায় এনেছিল। তখন আমাদের আরেক মনীষী মরোক্কোর বিখ্যাত আলেম আবদুল হাই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল কাবির আল কাত্তানি তার জবাবে নতুন করে আরেক কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম হলো – "আত তারাতিবুল ইদারারিয়্যাহ ফি নিযামিল হুকুমাতিন নাবাবিয়্যাহ"। এই কিতাবে তিনি চমৎকারভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী নীতিমালা ছিল, তা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষকথা -

এসব তো ইতিহাসের ছোট একটা উদাহরণ মাত্র। আমরা আরেকটু খুঁজলেই দেখতে পাবো যে, বর্তমানের প্রাচ্যবিদরা নতুন কোনো আপত্তি ইসলামের উপর আরোপ করছে না। বরং আরো শত বছর আগে তাদের বাপ দাদারা এসব আপত্তি করেছিল এবং তার জবাবে শত শত কিতাব লেখা হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের চর্বিত চর্বনে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। বরং আমরা একটু চোখ মেললেই দেখতে পাবো, তাদের সব আপত্তির জবাব আমাদের হাতের নাগালেই আছে।

আমাদের বিষয় ছিল সিরাত নিয়ে। এসব উদাহরণ দেয়া হলো এ কথা বোঝানোর জন্য যে, আমরা আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত পাঠ করবো

মূল উৎস থেকে। প্রাচ্যবিদদের লেখা কোনো সিরাত থেকে না। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন।